আজকের কাগজ
24 DEC 1993
পৃঃ ৫ কলাম ৭

মাননীয় চ্যান্সেলরের মাদ্রাসা প্রীতি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের মহা দুর্গতি

আবদুল খালেক

চ্যান্সেলরের বাংলা প্রতিশব্দ 'আচার্য' এবং ভাইস চ্যান্সেলরের বাংলা 'উপাচার্য'। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই শব্দগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যে ক'টি বাংলা প্রতিশব্দের ওপর প্রচন্ড আঘাত আসে তার মধ্যে 'আচার্য' এবং 'উপাচার্য' শব্দ দুটিও আছে। পাকিস্তানের প্রতি যাঁদের দুর্বলতা, বাংলার চেয়ে ইংরেজি-উর্দুর প্রতি তাঁদের অনুরাগ তুলনামূলকভাবে অনেক গভীর। সে কারণেই 'জয়বাংলা' হয়ে গেছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, 'বেতার' হয়ে গেছে রেডিও, আচার্য হয়ে গেছে চ্যান্সেলর। আচার্য শব্দের মধ্যে নাকি একটু সংস্কৃতের গন্ধ আছে, সুতরাং পাকিস্তান অনুরাগী শাসকবর্গের কাছে শব্দটি গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশে বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় সে সংখ্যা অতি নগন্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন চ্যান্সেলর অপরিহার্য। 'চ্যান্সেলর' একটি অতি সম্মানজনক পদ। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ দ্বারা যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত, পদাধিকার বলে দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত এবং সেই সুবাদে দেশের যিনি রাষ্ট্রপতি তিনিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। এর কোন বিকল্প নেই। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, কোন এক ঘটনায় প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি চ্যান্সেলরের দায়িত্ব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজের হাতে ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ৭৩ সালের অধ্যাদেশ তাকে সে সুযোগ দেয়নি। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাঙ্গা মন নিয়ে তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়েছে মৃত্যু পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদ যখন রাষ্ট্রপতি, তিনিও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালনে নানারকম ওজর-আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু '৭৩ সালের অধ্যাদেশ তাঁকেও কোন রকম ছাড় দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করতে হবে অথচ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পা রাখবার তাঁর কোন অধিকার থাকবে না একথা জেনে-শুনেই এরশাদ সাহেবকে বিষপান করতে হয়েছে। চ্যান্সেলর থাকবেন অথচ হুকুম-হাকাম করবার কোন সুযোগ মিলবে না, এ আবার কেমন আইন! কাজেই এ আইন ভাল লাগেনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের, পছন্দ হয়নি রাষ্ট্রপতি এরশাদের, মনে ধরছে না বর্তমান রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ আইনটি অমান্য করবার একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দেশে তখন সামরিক শাসন, এরশাদ সাহেবের প্রচন্ড দাপট। হঠাৎ খবর এলো সামরিক আইনের এক ফরমান বলে আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মজিবুর রহমানকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদের সাথে শিক্ষক সমিতির হয়ে আমাকেই লড়তে হয়েছিল। সে লড়াইয়ে '৭৩ সালের অধ্যাদেশ ছিল আমাদের রক্ষা কবচ। হার মানতে হয়েছিল রাষ্ট্রপতি তথা চ্যান্সেলরকে। কাজেই এ ধরনের অধ্যাদেশ ক্ষমতা লোলুপ রাষ্ট্রপ্রধান বা চ্যান্সেলরদের পছন্দ না হবারই কথা। এরশাদ সাহেব মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের মধ্যে থেকেও যেন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন তার শাসন ব্যবস্থা। অধ্যাদেশ বাতিল করবার উদ্যোগ এরশাদ সাহেব নিয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, তিনি নিজেই বাতিল হয়ে গেছেন।

গণতান্ত্রিক বিএনপি সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ বাতিলের পাঁয়তারা করে আসছে। বর্তমান সরকারের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের চর্চা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে তুলছে। নিজেদেরকে যারা গণতন্ত্রের ধারক এবং বাহক বলে দাবি করেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য যাঁরা জান-মাল কোরবান করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে তাঁরা গণতন্ত্রের চর্চা হতে দেবেন না, এ বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। এসব কথা-বার্তা, আচার-আচরণের মধ্যদিয়ে বিএনপি সরকারের প্রকৃত চেহারা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। সামরিক জান্তার মগজ থেকে যে দলের জন্ম, সে দল প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করতে পারে কি-না, তা আজ মূল্যায়নের সময় এসেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে রেখে বর্তমান সরকারকে একটু মূল্যায়ন করে দেখা যেতে পারে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ বাতিল হয়ে গেছে, এ কথা বলবার কোন সুযোগ সরকারের নেই। অধ্যাদেশটিকে বাতিল করতে হলে বিষয়টি সংসদে নিয়ে যেতে হবে। এবারের শীতকালীন সংসদ অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপিত হবে বলে জোর গুজব শোনা গিয়েছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে বোধ করি সরকার প্রমাদ গুণেছে, সংসদ পর্যন্ত বিষয়টি আসেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার হাল ছেড়ে দেবে, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। এবার সরকার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। অধ্যাদেশ বাতিল না করেই একে অকার্যকর করে তোলা হচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা যাক।

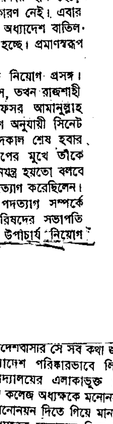

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ কোন ঐশী বাণী নয়। এর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু থাকতেই পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কখনও বলেননি অধ্যাদেশের কোন পরিবর্তন বা উন্নতি বিধান করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা শিক্ষক, তাঁরাই ভাল জানেন এই অধ্যাদেশের কোথায় কতটুকু সীমাবদ্ধতা আছে।

প্রথমেই উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রসঙ্গ। বিএনপি সরকার যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে, তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমেদ। তিনি '৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত উপাচার্য। তাঁর মেয়াদকাল শেষ হবার আগেই বর্তমান সরকারের প্রচন্ড চাপের মুখে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। সরকারের প্রশাসনযন্ত্র হয়তো বলবে প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমেদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। এরশাদ প্রশাসন রাষ্ট্রপতি সাত্তারের পদত্যাগ সম্পর্কে এরকম কথাই বলে থাকে। জিয়া পরিষদের সভাপতি প্রফেসর আনিসুর রহমানকে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ অধ্যাদেশ বিরোধী কিছু নয়। কিন্তু এই অস্থায়ী নিয়োগের মেয়াদকাল বছরের পর বছর চলতে পারে না। বর্তমান উপাচার্যকে নিয়ে সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে। সিনেটের মাধ্যমে তাঁর জিতবার কোন ভরসা নেই বলে উপাচার্য মহোদয় এ পর্যন্ত কোন সিনেট অধিবেশন ডাকেননি। সিনেটরগণ লিখিতভাবে সিনেট অধিবেশন দাবি করেছেন, কিন্তু উপাচার্যের তরফ থেকে কোন রকম জওয়াব নেই। সিনেটকে অকার্যকর অবস্থায় নিয়ে যাবার এ এক গভীর ষড়যন্ত্র।

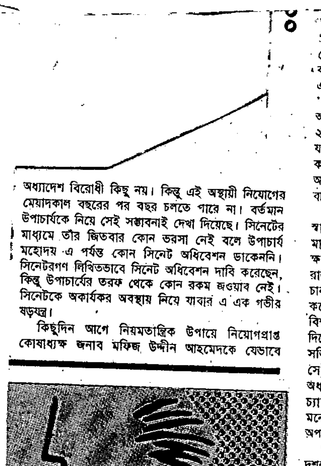

কিছুদিন আগে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ জনাব মফিজ উদ্দীন আহমেদকে যেভাবে

পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, তা এক নজিরবিহীন ঘটনা। মফিজ উদ্দীন সাহেবের কর্মদক্ষতা এবং সততা সর্বজনবিদিত। তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করার পেছনে কোনরকম দুরভিসন্ধি কাজ করেছে, তা অনুমান করা গিয়েছিল। আমাদের সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সিন্ডিকেটকে পাশ কাটিয়ে, অধ্যাদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে অত্যন্ত অনিয়মতান্ত্রিকভাবে উপাচার্য মহোদয় তার নিজের খেয়াল-খুশীমত একজন প্রখ্যাত রাজাকারকে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়েছেন। বিভাগে কোন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ অপরিহার্য, কিন্তু উপাচার্য মহোদয় অধ্যাদেশের এসব নিয়ম কানুনের কোন তোয়াক্কাই করছেন না। একের পর এক তিনি অধ্যাদেশ লংঘন করে চলেছেন।

'৭৩ সালের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি তথা চ্যান্সেলরকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান না করলেও ন্যায়সঙ্গত কিছু ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে যেমন সিনেট, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলে তিনি কিছু সদস্য মনোনীত করতে পারেন। এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে মাননীয় চ্যান্সেলর কিভাবে অধ্যাদেশকে লংঘন করেছেন, এবার সে দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে অধ্যাদেশ অনুযায়ী চ্যান্সেলর মহোদয় ১০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ১০ জন কলেজ অধ্যক্ষকে মনোনয়ন দিতে পারেন। এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে মাননীয় চ্যান্সেলর ... করেছেন, দেশবাসীর সে সব কথা জানা প্রয়োজন।

'৭৩ সালের অধ্যাদেশ পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত ১০টি কলেজ থেকে তিনি ১০ জন কলেজ অধ্যক্ষকে মনোনয়ন দেবেন।" কলেজ অধ্যক্ষকে মনোনয়ন দিতে গিয়ে মাননীয় চ্যান্সেলর একজন মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে মনোনয়ন দিয়ে বসে আছেন। '৭৩ সালের অধ্যাদেশ চালু হবার পর বিগত বিশ বছরে অধ্যাদেশ লংঘনের এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। গত ২৮.১১.৯৩ তারিখের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় যখন উক্ত মনোনয়নের কথা জানানো হয়, একাডেমিক কাউন্সিলের অভিজ্ঞ সদস্যগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং অবিলম্বে মাননীয় চ্যান্সেলরের কাছে উক্ত মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানান।

আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে ভূমিকা পালন করেছেন তাতে মাদ্রাসাপ্রীতি তার মধ্যে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্ষমতা হাতে এসেছে, এই সুযোগে এবার তিনি হয়তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করতে চান অথবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা হিসেবে গণ্য করেই তিনি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়ন দিয়েছেন। বর্তমান সরকার যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যি সত্যি মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করতে চান, তাহলে সেইভাবে অধ্যাদেশকে পরিবর্তন করে নিতে হবে। অধ্যাদেশ পরিবর্তনের আগে একাডেমিক কাউন্সিলে চ্যান্সেলর কর্তৃক আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে সদস্য মনোনয়ন সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এই মনোনয়ন ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু কলেজ অধ্যক্ষ নয়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে যে দশজন সদস্যকে একাডেমিক কাউন্সিলে মাননীয় চ্যান্সেলর মনোনয়ন দিয়েছেন, তার মধ্যে দলীয়করণের চেহারা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। দশজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের মধ্যে নাটোরের একটি অখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিকের নাম রয়েছে। ঘরের কাছে এতবড় একজন শিক্ষাবিদ রয়েছেন, অথচ আমরা তার নাম পরিচয় জানি না, হতে পারে এ সীমাবদ্ধতা আমাদের। অথবা এমনও হতে পারে শিক্ষাবিদ হিসেবে তার কোন পরিচিতিই নেই, শুধুমাত্র সরকারি দল করবার কারণেই শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর নামটি এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ কোন ঐশী বাণী নয়। এর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু থাকতেই পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কখনও বলেননি অধ্যাদেশের কোন পরিবর্তন বা উন্নতি বিধান করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা শিক্ষক, তাঁরাই ভাল জানেন এই অধ্যাদেশের কোথায় কতটুকু সীমাবদ্ধতা আছে। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ছেড়ে দিলে তাঁরাই অধ্যাদেশটিকে ত্রুটিমুক্ত করে দিতে পারবেন।

'৭৩ সালের অধ্যাদেশের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হয়েছে, শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে, ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ অভিযোগ সত্য নয়। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাদেশ নেই, সন্ত্রাস সেখানেও পুরোদমে চলছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের যদি মূল খুঁজে বের করতে ..., 'সুগন্ধা' পর্যন্ত যেতে হবে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা যাবে না, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জেনারেল এরশাদের শাসন স্বৈরশাসন বলে চিহ্নিত। এই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে অবদান রেখেছেন, তাকে কোন ক্রমেই ছোট করে দেখা যায় না। বলা যেতে পারে তাঁদের সক্রিয় আন্দোলনের ফসল আজকের বিএনপি সরকার। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশের ওপর যেভাবে আঘাত হানতে শুরু করেছে, তাতে ধারণা হচ্ছে এরশাদের স্বৈরাচারকে হারিয়ে দিতে বর্তমান সরকারের খুব বেশি সময় লাগবে না।

ডঃ আবদুল খালেক ঃ প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।